রাষ্ট্র কি একই গল্প বারবার শুনতে চায়?

বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে এখন যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আতঙ্কের নাম—ধর্ষণ। আরও ভয়ংকর হলো, ধর্ষণের পর হত্যা। চলতি মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক শিশু, কিশোরী ও নারী ধর্ষণ এবং নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন।

সংবাদপত্রের পাতায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিদিন নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। সেই নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে ছোট্ট রামিসার নাম। যে বয়সে একটি শিশুর স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে মাঠে দৌড়ে বেড়ানোর কথা, সেই বয়সেই তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

রামিসা এখন শুধু একটি নাম নয়; সে এই রাষ্ট্রের ব্যর্থতার প্রতীক। তার নিথর দেহের পাশে পড়ে ছিল আমাদের বিচারহীনতা, সামাজিক অবক্ষয় আর রাজনৈতিক উদাসীনতা।

চলতি মাসের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ভুক্তভোগীই শিশু ও কিশোরী। কোথাও মাদ্রাসাছাত্রী, কোথাও স্কুলছাত্রী, কোথাও প্রতিবন্ধী নারী। ধর্ষণের পর অনেককে হত্যা করা হয়েছে, আবার অনেক ঘটনায় পরিবারকে হুমকি দিয়ে মামলা না করার চাপ দেওয়া হয়েছে। সমাজের প্রভাবশালী অংশ, রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা অর্থের ক্ষমতা ব্যবহার করে অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি তৈরি করেছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, মানুষ এখন বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাতে বসেছে। রামিসার বাবার বক্তব্য—“বিচার চাই না”—আসলে একটি বাক্য নয়; এটি রাষ্ট্রের প্রতি গভীর হতাশার বহিঃপ্রকাশ। একজন বাবা যখন মেয়ের হত্যার বিচার চাইতে ভয় পান কিংবা বিচার পাবেন না বলে বিশ্বাস করেন, তখন বুঝতে হবে রাষ্ট্রের ভিত কেঁপে উঠেছে।

ধর্ষণের বিরুদ্ধে দেশে কঠোর আইন রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের বিধানও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—শাস্তির ভয় কি অপরাধীদের থামাতে পেরেছে? উত্তর স্পষ্ট—না। কারণ, আইনের কঠোরতার চেয়ে আইনের প্রয়োগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকে, সাক্ষীরা নিরাপত্তা

পায় না, প্রভাবশালীরা তদন্তে হস্তক্ষেপ করে, আর ভুক্তভোগীর পরিবার সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়। ফলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধীদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে।

এই পরিস্থিতির জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করলেই চলবে না। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ও সমানভাবে দায়ী। পরিবারে মানবিক শিক্ষা কমে যাচ্ছে, নারীকে মানুষ হিসেবে নয় বরং ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংস ভাষা, অশ্লীল কন্টেন্টের বিস্তার, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং মাদকাসক্তি—সবকিছু মিলে এক ভয়ংকর মানসিকতা তৈরি করছে।

অনেকেই এখন “জনতার আদালত”-এর কথা বলছেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার দিতে ব্যর্থ। কিন্তু রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে জনতার ক্ষোভ একসময় ভয়ংকর রূপ নেবে। সেটি কোনো সভ্য রাষ্ট্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়।

এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সামাজিক প্রতিরোধ। ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল কার্যকর করতে হবে। তদন্তের সময়সীমা বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। ভুক্তভোগী পরিবারকে নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা ও নারী-সম্মানবোধ জোরদার করতে হবে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয়ে অপরাধীদের রক্ষা করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

রামিসা আর ফিরে আসবে না। যারা এই মাসে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়েছেন, তারাও আর কোনোদিন পরিবারের কাছে ফিরবেন না। কিন্তু তাদের মৃত্যু যদি আমাদের বিবেককে না জাগায়, তবে আগামীকাল আরও অনেক রামিসা হারিয়ে যাবে। তখন হয়তো সংবাদপত্রের পাতায় শুধু নাম বদলাবে, কিন্তু গল্প একই থাকবে—ধর্ষণ, হত্যা, বিচারহীনতা। রাষ্ট্র কি সেই একই গল্প বারবার শুনতে চায়? নাকি এবার সত্যিই বদলাবে?

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের গনীউল আজম

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের সন্তান মো. গনীউল আজমকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (গ্রেড-২) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গোলাম রব্বানীর স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৪৯ অনুযায়ী মো. গনীউল আজমকে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছরের জন্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক (গ্রেড-২) পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এর আগে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিরাপত্তা টিমে দায়িত্ব পালন করেছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সাক্ষি ওরা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ খ্রিস্টান পল্লী মেহেরপুরের মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর-এর আম্রকাননে শুধু একটি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়নি; সেখানে ইতিহাস গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত, নিঃশব্দ শ্রম আর সাধারণ মানুষের অসাধারণ অংশগ্রহণে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ একটি দিন, একটি দৃশ্য, একটি নিঃশব্দ প্রত্যয়ের নাম। মুজিবনগর-এর সেই বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন

আজও যেন বাতাসে বহন করে সেই গোপন প্রস্তুতির গন্ধ, গ্রামবাসীর নিঃশব্দ সাহসের প্রতিধ্বনি। সকালের রোদ তখন নরম। আমগাছের ছায়া মাটিতে ছোপ ছোপ আলো ফেলেছে। ১৩ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকানন-এ দাঁড়িয়ে মনে হলো এই নীরবতা কখনোই নিছক নীরব ছিল না। ১৯৭১-এর সেই দিনটিতে, এই মাটিই ছিল উত্তাল ইতিহাসের কেন্দ্র।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে পপথ গ্রহণ করেন। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে বিলুপ্তি হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের ঐতিহাসিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামের সাধারণ মানুষ সরাসরি অংশ না নিলেও, তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই সরকার গঠন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতে পারতো না। তাদের ভূমিকা ছিল সমর্থন, সহানুভূতি, নিরাপত্তা, এবং সরবরাহ সংক্রান্ত সহায়তায়।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য যেকোনো ধরনের প্রস্তুতির জন্য গ্রামবাসীরা সহায়তা করেছিলেন। যেমন- মঞ্চ নির্মাণ, অতিথিদের জন্য স্থান তৈরি, খাবার এবং পানীয় সরবরাহ, অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তারা এই কাজগুলো নিজেরাই করেছিলেন।

সূর্য সেদিন ছিল নির্মম। বৈশাখের খরতাপ যেন মাটিকেও দগ্ধ করছিল। সূর্যও যেখানে মুজিবনগর আম্রকাননকে কুর্ণিশ করে। সেই মুজিবনগর আম্রকানন-এর গাছের ছায়াও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই তাপদাহ উপেক্ষা করেই ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। সেদিন মেহেরপুরের ১২ জন আনসার সদস্য। সাধারণ পোশাকে, কিন্তু চোখে কঠোর দৃঢ়তা। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান নবগঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার-কে।

দেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আইয়ুব হোসেন বলেনÑ আমাদের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর বড় ভূমিকা ছিল। ১৬ এপ্রিল জাতীয় নেতারাসহ ভারত সরকারের উচ্চপর্যায়ের কয়েকজন মুজিবনগরে এসে স্থান নির্ধারণ করে যান। অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা ও সফল করার দায়িত্ব ছিল বিএসএফের। ১৭ এপ্রিল কলকাতা প্রেসক্লাব থেকে দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের একত্রিত করে বিশাল গাড়ী বহর নিয়ে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে সবাই মুজিবনগরে হাজির হয়েছিল। সেদিন মুজিবনগরের জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম

হতনা।

সংগ্রাম কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক দোয়াজ আলী বয়সের ভারে হাঁপিয়ে উঠেছেন। স্মৃতি হাতড়ে জানান- সেদিন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গোলক মজুমদার, নদীয়ার জেলা প্রশাসক মি. মূখার্জি এবং বিএসএফের ৭৬ ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লে: কর্ণেল চক্রবর্তী দুজনে সাদা পোশাক পরে আসেন। আমি সংগ্রাম কমিটির সভাপতি জেনে মুজিবনগর আমবাগানের একটি স্থানকে চিহ্নিত করে একটি তোরণসহ মঞ্চের চর্তুরদিক বাঁশ দিয়ে ঘেরার নির্দেশ দিয়ে ফিরে গেলেন। তখনও জানিনা তারা এখানে কিসের অনুষ্ঠান করবে। নির্দেশমত এলাকার বিভিন্ন বাড়ি থেকে চৌকি, কাপড়, দড়ি, ঝাঁড় থেকে বাঁশ এবং দেবদারুর পাতা এনে স্থানীয়দের সহায়তায় তৈরী করা হয় তোরণ ও বড় মঞ্চ। সারারাত ধরে এই কাজ করা হয়। খুব সকালে তারা এখানে আসলে দেখেন ভারতীয় হেলিকপ্টার আকাশে মহড়া দিচ্ছে। এরপরপরই মুজিবনগর সীমান্ত পেরিয়ে ভারত থেকে অসংখ্য জীপ ও ট্রাক ঢুকতে শুরু করে। এই সমস্ত গাড়ি করে জাতীয় নেতারাসহ বিদেশী সাংবাদিক ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা আসেন। বিএসএফ পুরো এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। অনুষ্ঠানের জন্য চেয়ার, মাইক, টেবিল সবই আসে ভারত থেকে। এমনকি অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সাধারণ জনতাকে যে মিষ্টি ও পাউরুটি দেয়া হয়েছিল সেটাও এসেছিল ভারত থেকে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্থানীয় খ্রিস্টান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে পাঠ করা হয় ধর্মগ্রন্থ। ইতিহাসের সূত্রে জানা যায়, এক হিন্দু ভদ্রলোক গীতা পাঠ করেন- যা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের এক প্রতীকী ঘোষণা। এরপর বাজে জাতীয় সঙ্গীত- “আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’। কণ্ঠে হয়তো ছিল কম্পন, কিন্তু সেই সুরে ছিল স্বাধীনতার দৃঢ় অঙ্গীকার। সেদিন গানটা ছিল বুকের ভেতর থেকে উঠে আসা।

মুজিবনগরের দারিয়াপুর ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক বাকের আলী সেই শপথ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেছিলেন। তিনি জানান, সেদিন খুব সকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগরে উপস্থিত হন। তিনি তাদের চিনতেন না। স্থানীয় নেতাদের সাথে তিনি জাতীয় নেতাদের সন্মুখে গেলে অনুষ্টানে তাকে কোরআন তেলোয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ তার নাম লিখে নিলেন এবং রিহার্সালের সময় তেলোয়াত শুনলেন। মাত্র ৩০ মিনিট অনুষ্ঠানটির স্থায়ীত্ব থাকলেও উপস্থিত সকলের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার উম্মাদনা ও জীবনবাজির শপথ।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়েছিলেন মেহেরপুরের ১২জন আনসার সদস্য। ইতোমধ্যে ১০ জন মারা গেছে। বেঁচে আছেন দুইজন। এদেরই একজন বয়োবৃদ্ধ মো. সিরাজ উদ্দীন। প্রতিদিন তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আসেন। তিনি বলেন- সেদিন আমাদের ডাক পড়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে রাস্ট্রিয় মর্যাদায় সালাম জানানোর। আমরা গার্ড অব অনার দিয়েছিলাম ১২ জন আনসার। ওইদিনই ট্রেনিং দিয়েছিলেন তৎকালীন ঝিনাইদহের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) মাহবুব উদ্দীন। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা গার্ড অব অনার দিই সরকারকে। আর এক আনসার সদস্য আজিম উদ্দীন বলেন- তখন আনন্দ ভয় উত্তেজনা কাজ করছিলো। দেশি বিদেশী সাংবাদিকসহ হাজারো মানুষের সামনে প্রথম সারকারকে সালাম জানানোর সময় মনে যে প্রশান্তি পেয়েছিলাম তা বলে বোঝানো যাবেনা। পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

প্রত্যক্ষদর্শীর সুভাষ মল্লিকের ভাষায়- ওদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ছিল না, কিন্তু যে ভঙ্গিতে সালাম দিল- মনে হচ্ছিল এটাই স্বাধীন দেশের প্রথম সেনাবাহিনী। সেই অভিবাদন ছিল প্রতীকী, কিন্তু তা-ই হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সূচনালগ্নের প্রতিচ্ছবি।

মুজিবনগর স্মৃতিপ্রকল্প এলাকায় দেখা মেলে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী আহম্মদ খাঁ (৭১) রিক্সা ভ্যানে করে শষা ফেরি করছেন। তিনি বলেন- সে বছরই আমার বিয়ে হয়। ১৭ এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানের দিন হঠাৎ করেই হাজার মানুষ জড়ো হলো মুজিবনগরের এই আমবাগানে। তখন বাগানটি ভাগাড় হিসেবে গ্রামের মানুষ ব্যবহার করতো। সেদিন আমিসহ একদল যুবক বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি সংগ্রহ করে মানুষকে খেতে দিই। আশপাশের বাড়ি থেকে বউ ঝিরা পানি এনে মানুষের পিপাসা মিটায়। সেদিন সেই সরকারের পরিচালনায় দেশ স্বাধীন হয়। এখন আমি গর্বভরে বলি আমিও স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ সাক্ষি।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের পাশের প্রবীণা রোকসানা বেগম স্মৃতিচারণ করে বলেনÑ তখন আমি গৃহবধু এই বাড়ির। বৈশাখের দাবদাহে সবচেয়ে বড় দরকার ছিল পানি। চারপাশে তখন নিরাপত্তার ঝুঁকি, খোলা চলাফেরা কঠিন। গ্রামের কিশোর কিশোরিরা কলস কাঁখে নিয়ে কূপ থেকে পানি এনে দিচ্ছিল। আমরা আগে নিজেরা খাইনি, আগে তাদের পানি দিয়েছি। তখন মনে হচ্ছিলÑ ওরা ভালো থাকলে দেশ ভালো থাকবে। ওরা যখন আমাদের দেয়া মুড়ি, রুটি আর পানি খাচ্ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল, নিজের

সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছি।

সেদিন চারপাশে ছড়িয়ে ছিল গ্রামের তরুণরা। কেউ গাছে উঠে, কেউ দূরের পথের দিকে তাকিয়েÑ যদি পাকিস্তানি বাহিনীর কোনো নড়াচড়া দেখা যায়। একটি সংকেত ঠিক করা ছিলÑ কিছু হলে দ্রুত খবর পৌঁছে যাবে। আমরা ছিলাম চোখ, যাতে অনুষ্ঠানটা চোখের আড়ালেই থেকে যায় শত্রুর। বললেন স্মৃতিসৌধের পাশের প্রবীণ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। সব কিছু শেষ হওয়ার পরও কোনো উল্লাস ছিল না। ছিল নিঃশব্দ স্বস্তি।

কারণ সবাই জানত- এটা শেষ নয়, শুরু।

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মাহবুবুল হক মন্টু বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী মুজিবনগরে মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর ভিত্তিক বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে ভাষ্কর্যের মাধ্যমে। ৫ আগস্ট পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী একটি পক্ষ সেসব ভাষ্কর্য গুড়িয়ে দিয়েছে। সেগুলি শুধু পাথর বা কংক্রিটের ছিল না। সেখানে ছিল আমাদের ইতিহাস, আমাদের পরিচয়। ওগুলো ছিল আমার বাবার মতো হাজারো মানুষের আত্মত্যাগের দৃশ্যমান সাক্ষী। প্রতিমাসের একটি শুক্রবার আমি আমার সন্তানকে নিয়ে মুজিবনগর আসি। ছেলেকে দেখিয়ে বলতাম- দেখ- তোমার দাদুদের গল্প এখানে দাঁড়িয়ে আছে। এখন আমি তাকে কী দেখাবো?

ভবেরপাড়া গ্রামের প্রবীণ সুভাষ মল্লিক, বয়স এখন আশির কোঠায়। ৭১-এ ভবেরপাড়া মিশনের ফাদার ছিলেন। তিনি বলেনÑ আমরা তখন বুঝিনি এত বড় কিছু হতে যাচ্ছে। শুধু জানতাম, কিছু বড় মানুষ আসবে, দেশ বাঁচানোর কথা বলবে। ভয় ছিল, কিন্তু তার চেয়েও বড় ছিল আশা। শপথগ্রহণের পর শুধু অনুষ্ঠান শেষ হয়নিÑ শুরু হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়। গ্রামের অনেকেই সরাসরি যুক্ত হন মুক্তিযুদ্ধে। কেউ আশ্রয় দিয়েছেন, কেউ খাবার, কেউ তথ্য। আমরা বন্দুক ধরিনি সবাই, কিন্তু যারা ধরেছে, তাদের পেছনে আমরা ছিলাম।

মুজিবনগর সরকার-এর শপথ শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা ছিল না; এটি ছিল যুদ্ধের সংগঠিত রূপ, স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। একটি গ্রামের অমরত্ব

আজকের মুজিবনগর শান্ত। কিন্তু সেই ১২ আনসারের সালাম, গীতা পাঠের মৃদু উচ্চারণ, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, তৃষ্ণার্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া এক কলস পানি- সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে এক অনন্য ইতিহাস। এই ইতিহাস শুধু বড় নেতাদের নয়- এটি সেই নামহীন মানুষের, যারা

নিজেদের আড়ালেই রেখে একটি দেশকে সামনে এগিয়ে দিয়েছিল।

আজকের মুজিবনগর শান্ত। কিন্তু এই শান্তির নিচে লুকিয়ে আছে এক বিস্ফোরণ স্বপ্নের, সাহসের, আত্মত্যাগের। এই গ্রামবাসীরা ইতিহাসের মঞ্চে দাঁড়াননি, কিন্তু ইতিহাসকে দাঁড় করিয়েছেন। তাদের নাম হয়তো বইয়ে নেই, কিন্তু তাদের অবদান ছাড়া ১৭ এপ্রিলের সেই শপথ শুধুই একটি অসম্পূর্ণ আয়োজন হয়ে থাকত। মুজিবনগরের বাতাস আজও যেন বলেÑ আমরা ছিলাম, আছি, থাকবÑ বাংলার স্বাধীনতার নীরব প্রহরী হয়ে। আর

মুজিবনগরের মাটি বলে- স্বাধীনতা শুধু অর্জন নয়, অসংখ্য ছোট ছোট ত্যাগের সমষ্টি।

এই সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সংসদ

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘আজকের এই সংসদ বাংলাদেশের জনগণের সংসদ। দেশের মানুষ এই সংসদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে।’

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংসদের স্পিকারের বক্তব্যের পর শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আজ থেকে স্পিকার আর কোনো দলের নন, তিনি পুরো সংসদের অভিভাবক।

দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় গণতান্ত্রিক মানুষ এই সংসদের দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে। দেশ ও জনগণের স্বার্থে আমরা এই সংসদকে অর্থবহ করতে চাই।’

তিনি আরো বলেন, ‘গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। জনগণকে দুর্বল জনগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছিল এবং সংসদকে মানুষের অধিকার লুণ্ঠনকারীদের ক্লাবে পরিণত করা হয়েছিল।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিগত দেড় দশকে যারা নিজেদের এমপি পরিচয় দিতেন, তারা কেউ জনগণের ভোটে নির্বাচিত ছিলেন না। কিন্তু আজকের সংসদ জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংসদ। এটি বাংলাদেশের জনগণের সংসদ।’

তারেক রহমান বলেন, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা নয়, বরং সুনির্দিষ্ট যুক্তি ও বিতর্কের মাধ্যমে সংসদকে প্রাণবন্ত করে তুলতে চাই আমরা।

এ ক্ষেত্রে স্পিকারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে সংসদ পরিচালনায় আমরা স্পিকারকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবো।

বক্তব্যের শেষ দিকে স্পিকারকে নতুন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে -ড. শফিকুর রহমান

আমরা এমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই যেখানে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে। নারীদের প্রতি কেউ কুদৃষ্টিতে তাকাতে পারবে না, তাকালে সেই চোখ উপড়ে ফেলা হবে বলে ঘোষনা দিয়েছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ শহরের ওয়াজির আলী হাইস্কুল মাঠে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি নারীদের অবর্ননীয় ত্যাগের বর্ণনা করে বলেন, মায়েদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। সেই মায়েদের দিকে যারা খারাপ

দৃষ্টিতে তাকাবে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে।

বক্তব্যের শুরুতে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমিরে জামায়াত শহীদ ওসমান হাদি’র ইনকিলাব মঞ্চ ও জামায়াতের পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

এসময় তিনি বলেন, যারা বিগত আন্দোলনে স্বামী, স্ত্রী, সস্তান, বোন ও পিতাকে হারিয়েছেন আমি তাদের হয়ে আপনাদের সামনে দাড়িয়েছি। জবীনের ঝুকি নিয়ে চেষ্টা করেছি তাদের পাশে দাড়ানোর। কি অপরাধ ছিলো তাদের। তাদেরকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে। অপরাধ একটাই অপশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলা। এ কারণে তাদের বিরুদ্ধে নির্মম আচরণ করা হয়েছে। আমরা সন্তান হারানোদের কাছে গিয়েছি। তাদের আহাজারি সহ্য করতে পারিনি। অনেকে আছেন যারা তাদের সন্তানদের এখনো কোনো খোঁজ পাননি।

এসময় তিনি বলেন, পকেট থেকে জোর করে টাকা নেওয়া হয়েছে, চাঁদাবাজি করা হয়েছে। সেই ফ্য্যাসিবাদ বাংলায় আবার ফিরে আসুক আপনারা কি তাই চান। আমাদের সন্তানরা যারা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাদের প্রতি সববেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, এই জনপদে সবথেকে বেশি খুন হয়েছে। সোহানের মা বলেছিলেন, তোমরা আমার সন্তানকে মেরেছো ঠিক আছে কিন্তু তার চোখ দুটি কেন তুলে নিলে কি অপরাধ করেছিল আমার ছোট্ট সন্তান।

ঝিনাইদহ জেলা জামায়াত আয়োজিত ১১ দলীয় জোটের এ সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তৃতা করেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের পরিচালক মোবারক হোসাইন।

এছাড়া সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহ জেলা জামায়াতের আমির ও ঝিনাইদহ-২ আসনের জামায়াত জোট প্রার্থী মাওলানা আলী আজম মো. আবু বকর। বিশাল এ সমাবেশে বক্তৃতা করেন, ঝিনাইদহ-৩ আসনের জামায়াত প্রার্থী অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ঝিনাইদহ-৪ আসনের আবু তালিব ও ঝিনাইদহ-১ আসনের প্রার্থী এএসএম মতিউর রহমানসহ জেলা নেতৃবৃন্দ।

জামায়াতের আমিরের জনসভা কেন্দ্র করে দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা জনসভাস্থলে আসতে থাকে। বিকাল গড়ানোর আগেই কানায় কানায় ভরে ওঠে জনসভার মাঠ। পুরো ঝিনাইদহ শহর লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা নেতাকর্মীদের বাস ট্রাকসহ থ্রী হুইলারে চরম যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ পথচারিরা।

সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে ঝিনাইদহে এসে পৌছান জামায়াতের আমীর। এরপর সরাসরি সমাবেশস্থলে পৌছে মঞ্চে ওঠেন। ৬ টা ৫৫ মিনিটে বক্তৃতা শুরু করেন আমিরে জামায়াত। মাত্র ২৩ মিনিটের বক্তব্যে আগামির বাংলাদেশ কেমন হবে তার একটি সংক্ষিপ্ত রুপরেখা তুলে ধরে বলেন, মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে প্রতেকটি জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। মেডিকেল কলেজ করেই আমরা বসে থাকবো না। উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনবল দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। সঠিক শিক্ষা ছাড়া ভালো জাতি গড়া সম্ভব না। আমরা ঘোষণা করেছি বেকার সমস্যার সমাধান করতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। চাঁদাবাজি দুর্নীতি বন্ধ করা হবে।

প্রিয় ঝিনাইদহবাসি পাশের জেলা যশোরে যান সেখানে মেডিকেল কলেজ আছে কিন্তু রাস্তার বেহাল দশা। সরকারের কি জনশক্তি নাই। তাহলে অবকাঠামো কেন উন্নয়ন হচ্ছে না। রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করা হয়েছে। আমরা কথা দিচ্ছি জামায়াত ইসলামী ক্ষমতায় গেলে চাঁদাবাজ ও লুণ্ঠনকারীদের পেটে হাত দিয়ে সব সম্পদ বের করে আনা হবে, সে দেশে অথবা বিদেশে থাক। বেকারদেরর ভাতা দিয়ে আমরা অপমানিত করতে চাই না। বেকারদের যোগ্যতার স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

আমরা দুর্নীতিকে লালকার্ড দেখাতে চাই। দুর্নীতিবাজদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের লজ্জা করে না। দুর্নীতি ছেড়ে দাও নইলে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা কর। চাঁদাবাজির থেকে ভিক্ষা করা সম্মানের।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, এ জাতির সন্তানেরা যুগে যুগে রক্ত দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আমরা তাদের সম্মান দিতে চাই। ২৪ এ বিপ্লব করেছে, ২৬শে আরেকটি বিপ্লব করতে হবে। আগামি ১২ তারিখে ব্যালট বিপ্লব করতে হবে। দেশের উন্নয়নে এ বিপ্লব করতে হবে।

বক্তৃতা শেষে তিনি জেলার চারটি সংসদীয় আসনের ১১ দলীয় জোটের দাড়িপাল্লার প্রার্থী ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা উপজেলা) এএসএম মতিউর রহমান, ঝিনাইদহ-২ (সদর ও হরিণাকুণ্ডু) আলী আজম মোহাম্মদ আবু বকর, ঝিনাইদহ-৩ (কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর উপজেলা) অধ্যাপক মতিয়ার রহমান এবং ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ উপজেলা ও সদরের ৪টি ইউনিয়ন) মাওলানা আবু তালিবকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের হাতে দাড়িপাল্লা তুলে দেন।

কেউ বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখতে পাবা

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে দলের নারী শাখার প্রচার কার্যক্রমে বিভিন্ন স্থানে বিএনপি’র বাধা দেওয়ার ইঙ্গিত করে ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখানো হবে।

তিনি বলেছেন, ‘দিশেহারা কেউ কেউ জনগণের ভোটে পরাজিত হওয়ার ভয়ে ১১ দলের পক্ষে যে-সব মা-বোনেরা নির্বাচনী ক্যাম্পেইনে যাচ্ছেন, তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করছে, অভদ্র আচরণ করছে। আমাদের নতুন করে সুড়সুড়ি দিও না, আমাদের পরীক্ষা করার কিছুই নেই। জামায়াতের কর্মীরা এক আল্লাহ ছাড়া, হিমালয়ের সামনেও মাথানত করে না। আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিও না। সুতরাং বেয়াদবি করলে আগুনের ফুলকি দেখানো হবে।’

চুয়াডাঙ্গায় গতকাল সোমবার এক নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন, জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। এদিন বিকেল ৫টার দিকে শহরের টাউন ফুটবল মাঠে আয়োজিত এ জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তিনি।

জামায়াতে ইসলামী থেকে নির্বাচিত হলে জনপ্রতিনিধি ও তাঁর স্বজনদের সম্পদের হিসাব প্রতিবছর প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে বলে জানিয়েছেন দলটির আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের যে-সব জনপ্রতিনিধি জয়ী হবেন, তাঁরা কখনো সম্পদের পাহাড় বানাবে না। তাঁদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে না। প্রতিবছরে তাঁদের এবং স্বজনদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করতে বাধ্য থাকবে।’

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে যুবসমাজের হাতকে দেশ গড়ার কারিগর হিসেবে গড়তে চান জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, ‘আজকের যুবসমাজ সেই বস্তাপচা রাজনীতি দেখতে চায় না। ৫৪ বছরে যে রাজনীতি বাংলাদেশকে অন্ধকার গলিতে ঢুকিয়ে দিয়েছে, অন্য রাষ্ট্রকে তাঁবেদারি করেছে সেই রাজনীতি আমরাও চাই না।’

জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমীনের সভাপতিত্বে জনসভায় আরও বক্তব্য দেন, দলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ মোবারক হোসাইন, ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিগবাতুল্লাহ্, জাপা’র মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা ফারুক এহসান, এবি পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী ফোরামের মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটি গঠন

বাংলাদেশ বেসরকারি শিক্ষক ও কর্মচারী ফোরামের মেহেরপুর সদর উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মেহেরপুর বেসরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত এক সভার মাধ্যমে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি গঠিত হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিনকে

সভাপতি এবং টেংরামারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. ফজলুল হককে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।এছাড়াও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন বলিয়ারপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. আখতারুজ্জামান।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে জেলা কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে নবগঠিত কমিটিকে শুভেচ্ছা জানান।

দর্শনা সীমান্তে ১৪ ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ

একই পরিবারের নারী-পুরুষ, বৃদ্ধা ও শিশুসহ মোট ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশী আখ্যা দিয়ে ভারতীয় বিএসএফ জোরপূর্বক বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করিয়েছে বলে অভিযোগ করছে ভুক্তভোগীরা। গতকাল শুক্রবার সকালের দিকে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ করে তারা।

জানা গেছে, অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগেশ্বরপুরের বাসিন্দা। তারা মুসলিম পরিবারের হওয়ার কারণে তাদেরকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ভারতীয় এই নাগরিরা।

তবে শুক্রবার সকালে বাংলাদেশর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা সীমান্তে প্রবেশের পর আশে পাশে বিভিন্ন স্থানে ঘোরাফেরা করে পরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থান নিলে স্হানীয়রা তাদের কথা শুনে সাময়িক ভাবে খোলা স্থানে তাবু করে থাকার ব্যবস্থা করেন এবং খাবার ও শীতের বস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করেন। পরে বিষয়টি সন্ধ্যার পর জানাজানি হলে স্থানীয় সাংবাদিকরা ঘটনা স্থলে পৌঁছে তথ্য নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এরপর প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুলিশ, বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং অনুপ্রবেশকারী ১৪ জন ভারতীয় নাগরিকের তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

ভুক্তভোগীরা বলেন, আমরা জন্মসূত্রে ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের বাসিন্দা। কিন্তু আমার বাবা ছোট বেলায় আমার দাদার সাথে ভারতে চলে আসে। এরপর তিনি ভারতেই বড় হয়েছেন এবং আমাদের জন্মস্থান ভারতেই, আমরা ভারতীয় নাগরিক, আমাদের আধার কার্ড, রেশন কার্ড আছে কিন্তু ভারতীয় পুলিশ জোরপূর্বক সেগুলো কেড়ে নিয়েছে। আমরা সকলেই মুসলিম মোট ১৪ জন সদস্য একই পরিবারের পুরুষ ৫ জন, মহিলা ৫ জন, বাচ্চা ৪ জন।

ভারতীয় ১৪ জন নাগরিক হলো, ভারতের উরিষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুরের একই পরিবারের বাসিন্দা মৃত খাদিম খা’র মেয়ে গুলশান বিবি (৯০), মৃত শেখ হারুনের ছেলে শেখ জব্বার (৭০), মৃত শেখ হোসেনের মেয়ে

আলকুম বিবি (৬৫), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ উকিল (৪০), মৃত শফিক খানের মেয়ে সাবেরা বিবি (৩৫), শেখ উকিলের মেয়ে শাকিলা খাতুন (১১), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ হাকিম (৪৫), মৃত শেখ ইসরাফিলের মেয়ে সামসেরি বিবি (৪০), শেখ জব্বারের ছেলে শেখ রাজা (৩০), মৃত শেখ আলিমের মেয়ে মেহেরুন বিবি (২৫), শেখ রাজার মেয়ে নাসরিন পারভিন
(১২) এবং দুই ছেলে শেখ তৌহিদ (১১) ও শেখ রহিদ (০২) এবং শেখ জব্বারের ছেলে শেখ বান্টি (২৮)।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন (BHRC) আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার উদ্যোগে মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গ্তকাল শুক্রবার বিকাল ৪টায় আলমডাঙ্গা শাখা কার্যালয়ে এই সভা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিগত সময়ে শাখার পক্ষ থেকে সফলভাবে পরিচালিত কম্বল বিতরণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আসন্ন দিনগুলোতে উপজেলা ব্যাপী অসহায় ও দুস্থ মানুষের তালিকা প্রণয়ন এবং মানবাধিকার কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে একটি বার্ষিক পঞ্জিকা তৈরির বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন আলমডাঙ্গা শাখার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরাফত রাসেলের মাতার রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন, শাখার সভাপতি আল আমিন হোসেন, সহ-সভাপতি মানোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি খাইরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরাফত রাসেল, শিক্ষা সম্পাদক আহসান কবির বকুল, দপ্তর সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, সহ দপ্তর সম্পাদক জাহিদ হাসান, সদস্য আলী আব্বাস

ডন ও ইমরানসহ শাখার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুরে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস পালিত

জেলা প্রশাসন এবং বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের কর্মরত সহযোগী সংস্থাগুলোর আয়োজনে মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় “বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন দিবস ২০২৫” পালিত হয়েছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে র্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সিডিপি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুবাহ নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ আশাদুল ইসলাম, উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, মেহেরপুর। সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন প্রতিনিধিত্বকারী সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মঈন-উল-আলম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মউকের উন্নয়ন কর্মী মুরাদ হোসেন, পল্লী জনউন্নয়ন কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া, আরভির নির্বাহী পরিচালক জনাব আনারুল ইসলাম, পলাশিপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির পরিচালক মোঃ কামরুজ্জামান, সিডিপির পরিচালক জন প্রভঞ্জন এবং সুফিয়া খাতুনসহ আরও অনেকে।

এর আগে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সিডিপি অফিস প্রাঙ্গণে এসে শেষ হয়। এ সময় বিভিন্ন সংস্থার প্রধান, কর্মকর্তা-কর্মচারী, উপকারভোগীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ র্যালি ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।